Debayan Chaudhuri/B.A(H)/Bengali/SEM-II/CC-4

চৈতন্যজীবনী ও মঙ্গলকাব্য সাহিত্যপাঠ/ চৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চৈতন্য জীবনীকাব্য হল বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'। প্রথমে এর নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল', পরে নাম হয়- 'চৈতন্যভাগবত'। 'প্রেমবিলাস' কাব্যে বলা হয়েছে— "চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল/ বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।"

শ্রীচৈতন্যের পার্ষদেরা তাঁকে কৃষ্ণ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের জীবনকে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে দেখতে চান নি। এমন প্রয়াস বৃন্দাবনদাস প্রথম করেন, তাই তাঁর কাব্যের নাম 'চৈতন্যভাগবত'। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইতে বলেছেন—

> চৈতন্যভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে। শিশু চৈতন্যপ্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেছেন,-- তাঁহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিতেছেন, কখনও শচীমাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন—তাঁহার পদাঙ্কে ধ্বজব্রজাঙ্কুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে—এই কথাগুলি ভাগবতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। অতিক্রান্ত শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যামুগ্ধ যুবক, পরে ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার,--সুতরাং উভয় চরিত্রে ঐক্য অতি অল্প। তথাপি গোবিন্দদাস সততই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্যলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তিনি শিষ্য-বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে—"সনকাদি শিষ্যগণবেষ্টিত বদরিকাশ্রমে আসীন"—নারায়ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষ্যে "হৈহয়, বাণ, নহুষ, নরক, রাবণ" প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কল্পিত ঐক্যের কেশপ্রমাণসূত্র যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২, পৃ: ৩৬১)

'চৈতন্যভাগবত' লেখার ক্ষেত্রে বৃন্দাবনদাস 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' বা মুরারি গুপ্তের কড়চার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করেছিলেন। মুরারি গুপ্ত যেভাবে চৈতন্যের জীবনকে ভাগ করে দেখতে চেয়েছিলেন, বৃন্দাবনদাস তার অনুসারী হয়েছেন। গয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মুরারির গ্রন্থের প্রথম প্রক্রম, চৈতন্যভাগবতে তাই আদিখণ্ড। দ্বিতীয় প্রক্রমে চৈতন্যের নবদ্বীপে ভাব-প্রকাশ, অন্যটিতে মধ্যখণ্ড। তৃতীয় প্রক্রমে মুরারি গুপ্ত যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন তাই নিয়ে 'চৈতন্যভাগবত'কার লিখেছেন অন্ত্যখণ্ড। মুরারি গুপ্ত চতুর্থ প্রক্রমে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন দর্শন ছিল, বৃন্দাবনদাস তা বাদ দিয়েছেন। মুরারি গুপ্তের লেখা ঘটনাগুলি বৃন্দাবনদাস নিজের মতো

আত্মস্থ করেছেন, কখনোই আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। 'চৈতন্যভাগবতে' এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে যেগুলি মুরারি গুপ্ত লেখেননি।

'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। বিমানবিহারী মজুমদার রামগতি ন্যায়রত্নের মতকে মান্যতা দিয়েই, ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই কাব্য লেখা হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—" অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।/ চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।।" আবার – " নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।/ সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসার।।" বলছেন—" সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত রায়।/ সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়।।"—এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, নিত্যানন্দের আদেশে যে কাব্যরচনার সূত্রপাত, তা চৈতন্যের তিরোধানের ১৫ বছর পরে কি লেখা সম্ভব? বিমানবিহারী অনুমান করেছেন যে, বৃন্দাবনদাস হয়ত নিত্যানন্দ প্রভুর শেষ বয়সের শিষ্য ছিলেন। তাঁর থেকে চৈতন্য জীবনের অনেক ঘটনা শুনেছিলেন কবি, কিন্তু কাব্যরচনা সমাপ্ত হবার আগেই নিত্যানন্দের মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে কবিকর্ণপুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য রচনা করেন, সেই বইতে 'চৈতন্যভাগবতে'র প্রভাব কিংবা বৃন্দাবনবাসের নাম অনুপস্থিত। সুতরাং ১৫৪৮ সালকেই কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যপার্ষদদের মধ্যে অদ্বৈত প্রভু ও গদাধর গোস্বামীর থেকেও চৈতন্যের জীবনের অনেক ঘটনা শুনেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বিশ্বম্ভর মিশ্র গয়া থেকে ফিরে আসার পর তেইশ বছর বয়সে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। 'চৈতন্যভাগবতে' বর্ণিত মধ্যখন্ডের তৃতীয় অধ্যায় থেকে গ্রন্থের শেষ অংশ পর্যন্ত নিত্যানন্দ যুক্ত ছিলেন। চৈতন্যের জীবনের যে ঘটনাগুলির সঙ্গে নিত্যানন্দের যোগ ছিল না, বৃন্দাবনদাস হয় সেগুলিকে বাদ দিয়েছেন; নাহলে সংক্ষেপে লিখেছেন। গ্রন্থের শুরুতে সূত্রাকারে ছিল—

শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌর রায়।
ঝাড়িখণ্ড দিয়া পুন গেলা মথুরায়।।
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী।।
শেষখণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরি সঙ্কীর্তন।।

এই ঘটনাগুলি নিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যক্ষ না করায় বৃন্দাবনদাস আর বর্ণনা করেননি। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ কাব্যের ক্ষেত্রে জরুরি হলেও কবি নীরব থেকেছেন। 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যের অন্ত্যখন্ডটি অসম্পূর্ণ। এই পর্বে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তীকাল থেকে নীলাচল বাসের কিছু কাহিনি পাওয়া যায়। নীলাচললীলা লেখার জন্য কবিকে পরোক্ষ বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কেবল গৌড়লীলার ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ বিবরণ পেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব ছাড়াও আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভূদেব চৌধুরী। আমরা জানি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—"নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।/ চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।।" অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর কথা বলতে বলতে কবি এমন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, যে কাব্য সমাপ্ত করতে পারেননি। তাঁর কাব্যের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে—'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।"

'চৈতন্যভাগবত' তিন খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীচৈতন্যের গয়া গমন পর্যন্ত আদিখন্ডের বিষয়। মধ্যখন্ডে চৈতন্যের প্রকাশ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে শেষখন্ড। প্রত্যেকটি খন্ডের বিষয়সূত্র বলা হয়েছে আদিখণ্ডের প্রথমেই।

গয়ায় অবধি আদি খন্ডের বিলাস।
কীর্তন করিয়া আদি অবধি সন্ন্যাস
এই হৈতে কহি মধ্যখন্ডের বিলাস।
শেষখন্ডে বিশ্বম্ভর করিল সন্ন্যাস
শেষখন্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বর্ণিবেন বর্ণিত আছেন প্রভুব্যাস।

'চৈতন্যভাগবতে'র খন্ড অনুযায়ী অধ্যায় বিভাজন এরকম—আদি খন্ড—১৫
মধ্য খন্ড—২৬
শেষ খন্ড—৯
সর্বমোট—৫০টি অধ্যায়

আদিখন্ডের বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হল--

১. সূত্রবর্ণন ২. জন্মবর্ণন ৩. কোষ্ঠী গণন বর্ণন ৪. নামকরণ অন্নপ্রাশনাদি বর্ণন, ৫. বিদ্যারম্ভ এবং জলকেলি বর্ণন, ৬. বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণ এবং পুনঃচাঞ্চল্যভাব বর্ণন, ৭. যজ্ঞ সূত্রধারণ এবং মিশ্রচন্দ্রের পরলোকগমন বর্ণন, ৮.নিত্যানন্দের বাল্যলীলা এবং তীর্থযাত্রা বর্ণন, ৯. গৌরাঙ্গের বিবাহ এবং বিদ্যারম্ভ বর্ণন, ১০. নগরভ্রমণ বর্ণন, ১১. দিগ্‌বিজয়ীর উদ্ধার বর্ণন, ১২. বঙ্গ-দেশবিলাস বর্ণন, ১৩. দ্বিতীয় বিবাহ বর্ণন, ১৪. হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণন, ১৫. গয়াভূমিগমন বর্ণন।

সুকুমার সেন আলোচ্য গ্রন্থটির তত্ত্বভাবনা সংক্ষেপে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

> ...চৈতন্যভাগবতে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে সর্বদেবতার দেবতা বিষ্ণু দ্বাপরযুগের শেষভাগে বাসুদেব কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁর উপদেশবাণী আছে ভগবদ্‌গীতায় তাঁর চরিতবর্ণনা আছে শ্রীভাগবতপুরাণে। বিষ্ণু-কৃষ্ণের পরমধাম হইল বৈকুণ্ঠ। এই দৃষ্টিতে বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণু-কৃষ্ণের কলিযুগের অবতার বলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নামসংকীর্তন ধর্ম প্রচার করিয়া কলিযুগের মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইতে।
>
> (চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাডেমি, ২০০৩, পৃ: ৯)

পরিশেষে, আর দু-একটি কথা —

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থটি শুধু চৈতন্যদেবের জীবনীর পূর্বখণ্ডের বিবরণ নয়। এই কাব্যটির মধ্য দিয়ে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবদের ধর্ম বিশ্বাসের একটি স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্রে রেখে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং অন্যান্য পরিবারবর্গ যে ধর্মমণ্ডলী সংগঠিত করেন এবং যে ধর্মাদর্শ প্রচার করতে থাকেন তার মূল ভিত্তি ও ঐতিহাসিক বিবরণ দুইই এই গ্রন্থে লব্ধ।

...চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার অনেক আচার আচরণকেই এ কালের যুক্তিপ্রবণ মন বৃন্দাবন দাসের অতিকথন বলে সংশয় করতে পারে। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচারের পূর্বে আপামর বাঙালি যে দৃষ্টিতে নদিয়ার নিমাইকে অনুভব করত তারই রূপ ধরা পড়েছে। পাঠক যদি বলে ভাগবতের কৃষ্ণের লীলাগুলির সঙ্গে অনেকটা মিলিয়ে নদিয়ার নিমাইয়ের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আবাল্য তিনি কৃষ্ণের অনুরূপ কার্য করে গেছেন, এগুলি কবি কল্পনার আরোপ মাত্র। কিন্তু বিষয়টির মধ্যে কিঞ্চিৎ জটিলতা আছে। বৃন্দাবন দাসের সময়কার একটা বৃহৎ সংখ্যক বঙ্গবাসী নদিয়ার এই ব্রাহ্মণকে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছিল এবং ধর্ম ও ভক্তির আন্দোলনগুলি মানুষের গভীর বিশ্বাসের উপরই ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য জীবনীর তথ্যগত বিন্যাসে যতই ফাঁক থাক সমকালীন রচনা দ্বারা সেই ফাঁক পূর্ণ করা হয়েছে।

(মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১১, পৃ: ৯৯-১০০)